বাচ্চাদের
শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিকাশ

প্রুফরিড, সম্পাদিত ও পুনর্বিন্যস্ত সংস্করণ

শরীরচর্চা
শক্তি ও ফোকাস

ঘুম
স্মৃতি ও পুনরুদ্ধার

পুষ্টি
বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য

সৃজনশীলতা
কল্পনা ও লেখা

লেখক: বিপ্লব পাল
অনু-লেখিকা: কোয়েল সরকার

জীবন ও জীবিকা

পাঠকের জন্য

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কোনো আলাদা আলাদা বিষয় নয়; দুটির গভীর সম্পর্ক আছে। একটি শিশু যখন খেলাধুলা করে, পর্যাপ্ত ঘুমায়, ভালো খাবার খায়, গল্প শোনে, প্রশ্ন করে এবং নিরাপদ পরিবারে বড় হয়, তখন তার শেখার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, সামাজিকতা ও কল্পনাশক্তি একসঙ্গে বাড়ে।

এই বইটি অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ব্যবহারিক গাইড। এখানে পড়াশোনা, শরীরচর্চা, খাদ্যাভ্যাস, মানসিক স্বাস্থ্য, গণিত, ভাষা, কোডিং, সৃজনশীলতা এবং ভবিষ্যতের কর্মজগত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূল লক্ষ্য একটাই—শিশুকে শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনের জন্য প্রস্তুত করা।

অভিভাবকদের জন্য বইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো: শিশুকে ভয় দেখিয়ে, তুলনা করে বা অতিরিক্ত টিউশনের চাপে ফেলে শেখানো যায় না। শেখার আনন্দ, প্রশ্ন করার স্বাধীনতা, ভুল থেকে শেখার সাহস এবং নিয়মিত জীবনযাপন—এসবই দীর্ঘমেয়াদে বড় সম্পদ।

স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে এই বইয়ের আলোচনা সাধারণ শিক্ষামূলক। কোনো শিশু দীর্ঘদিন মনমরা থাকে, ঘুম-খাওয়ার বড় পরিবর্তন দেখা যায়, আত্মহানির কথা বলে, বাস্তবতা-বিভ্রান্তি বা গুরুতর আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়—তাহলে দেরি না করে যোগ্য চিকিৎসক বা মানসিক-স্বাস্থ্য পেশাদারের সাহায্য নেওয়া জরুরি।

এই সংস্করণে পাঠযোগ্যতা, ভাষা, বানান, বিন্যাস এবং অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা নতুন করে গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে বইটি হাতে নিয়ে একজন পাঠক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পড়তে পারেন।

শিশুর বিকাশের চারটি স্তম্ভ

শুধু নম্বর নয়; শিশুর শেখার ক্ষমতা গড়ে ওঠে জীবনযাপনের সামগ্রিক অভ্যাসে।

শরীরচর্চা
প্রতিদিন ঘাম ঝরানো খেলাধুলা বা ব্যায়াম মনোযোগ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

ঘুম
গভীর ঘুম স্মৃতি সংরক্ষণ করে এবং পরের দিনের শেখাকে সহজ করে।

পুষ্টি
ঘরের খাবার, শাক-সবজি, প্রোটিন ও জল শিশুর শরীর-মনের জ্বালানি।

সৃজনশীলতা
গল্প, গান, আঁকা, কবিতা ও কল্পনা শেখাকে গভীর করে।

চিত্র: শিশুর বিকাশের চারটি মূল স্তম্ভ

সূচিপত্র

১. ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট: দুটি পরীক্ষা
২. পর্কুপাইন ডিলেমা
৩. মানসিক স্বাস্থ্য ও ডিপ্রেশন
৪. মেধা, পরিবেশ ও গাইডেন্স
৫. বাঙালির খাদ্যাভ্যাস
৬. অ্যাক্টিভ ম্যাথ ও স্টোরিটেলিং
৭. অঙ্ক শেখার পথ
৮. বাংলা-ইংরেজি ভাষা-নির্দেশ
৯. তুলনা বন্ধ করুন
১০. শিশুদের কোডিং
১১. পোমোডোরো ও মনোযোগ
১২. অ্যাসাইনমেন্ট পরীক্ষা
১৩. অভিভাবক ও সম্পর্ক
১৪. মুখস্থ বনাম বোঝা
১৫. সেকেন্ড সেলফ ও ইনার সেলফ
১৬. স্কুল থেকেই প্রোগ্রামিং
১৭. ব্রেইন ডেভেলপমেন্টে অভিভাবক
১৮. সফলতার ৬ অভ্যাস
১৯. প্রাইমারি অঙ্ক ও বিজ্ঞান
২০. প্রতিদিন শরীরচর্চা
২১. কবিতা ও কল্পনাশক্তি
২২. অটোমেশন ও ভবিষ্যৎ
২৩. শিক্ষার বাজার

অধ্যায় ১: ছেলেমেয়েদের ব্রেইনের ডেভেলপমেন্ট—দুটি সহজ পরীক্ষা

দীর্ঘদিন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতায় একটি বিষয় বারবার চোখে পড়ে: ভালো নম্বর পেলেই যে একজন ছাত্র পরিষ্কারভাবে ভাবতে বা গুছিয়ে বলতে পারবে, তা নয়। অনেক সময় দেখা যায়, সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দুই মিনিটে সাজিয়ে বলতেও তারা হিমশিম খায়। এই সমস্যার শিকড় শুধু পড়ার বইয়ে নয়; মস্তিষ্কের মনোযোগ, স্মৃতি, ভাষা ও চিন্তার চর্চার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

শেখার ক্ষেত্রে দুটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে জরুরি—ফোকাসড থিংকিং এবং ডিফিউজড থিংকিং। ফোকাসড থিংকিং হলো এক সময়ে একটি বিষয়ে মন ধরে রাখা, তথ্য মনে রাখা এবং ধাপে ধাপে কাজ শেষ করা। ডিফিউজড থিংকিং হলো ছড়ানো তথ্যকে মিলিয়ে দেখা, অভিজ্ঞতা থেকে প্যাটার্ন খুঁজে বের করা এবং সমস্যার বিকল্প সমাধান ভাবা।

ফোকাসড থিংকিং বোঝার একটি সহজ উপায় হলো মনে মনে গুণ করা। এটি অঙ্কের পরীক্ষা নয়; বরং শিশু কতক্ষণ মনকে এক জায়গায় রাখতে পারছে, কতগুলো ধাপ ধরে রাখতে পারছে, এবং মাঝপথে মন সরে যাচ্ছে কি না—তা বোঝার একটি উপায়। ছোটদের ক্ষেত্রে দুই অঙ্কের গুণ, বড়দের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তিন বা চার অঙ্কের গুণ অনুশীলন করানো যেতে পারে। লক্ষ্য নম্বর নয়, মনোযোগের সহনশীলতা বাড়ানো।

ডিফিউজড থিংকিং বোঝার জন্য শিশুকে বলা যেতে পারে: ‘গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কী কী করেছ, সময় ধরে সাজিয়ে বলো।’ অনেকে ভাবেন এটি সহজ, কিন্তু আসলে এটি স্মৃতি, ক্রম, ভাষা এবং অভিজ্ঞতার সংযোগ—সব একসঙ্গে ব্যবহার করে। যে শিশু এভাবে দিনের ঘটনা সাজাতে পারে, তার চিন্তা সংগঠিত করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ে।

এই দুই ধরনের চিন্তা বাড়াতে শুধু পড়াশোনা যথেষ্ট নয়। নিয়মিত শরীরচর্চা, খেলাধুলা, পর্যাপ্ত ঘুম, গল্প বলা, লেখা, আঁকা, গান, বাদ্যযন্ত্র, দলগত খেলা এবং বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে পড়াকে মিলিয়ে দেখা—এসবের দরকার আছে। অতিরিক্ত টিউশন, সারাদিন বসে থাকা এবং মোবাইলের দ্রুত আনন্দ শিশুর মনোযোগকে দুর্বল করতে পারে।

অভিভাবকদের উচিত শিশুকে প্রতিদিন ছোট অনুশীলন করানো: মনে মনে হিসাব, ছোট অনুচ্ছেদ পড়ে নিজের ভাষায় বলা, আগের দিনের রুটিন সাজানো, গল্পের ঘটনাগুলো ক্রমে বলা, অথবা বাজারের হিসাব মেলানো। এগুলো শিশুর শেখার ভিত শক্ত করে এবং তাকে দীর্ঘমেয়াদে স্বশিক্ষায় সক্ষম করে।

ফোকাসড ও ডিফিউজড থিংকিং: ঘরোয়া পরীক্ষা

এগুলো পরীক্ষার নম্বরের জন্য নয়; শেখার প্রস্তুতি বুঝতে সাহায্য করে।

ফোকাসড থিংকিং
মনে মনে গুণ, সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ পড়ে বলা, বা ৩০ সেকেন্ড এক বিষয়ে মন রাখা।

ডিফিউজড থিংকিং
গতকালের কাজ সময় ধরে সাজিয়ে বলা, গল্পের ঘটনাগুলো ক্রমে সাজানো, বা সমস্যার বিকল্প পথ খোঁজা।

দেখার বিষয়
শিশু কি চিন্তা ধরে রাখতে পারছে, নাকি মাঝপথে হারিয়ে ফেলছে?

চর্চা
প্রতিদিন ছোট অনুশীলন, খেলা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং শরীরচর্চা।

অধ্যায় ২: বাবা-মায়ের ঝগড়া ও শিশুর সুস্থ বেড়ে ওঠা—পর্কুপাইন ডিলেমা

বাড়ির অশান্তি শিশুদের পড়াশোনা, মনোযোগ, আত্মবিশ্বাস এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বাবা-মায়ের ঝগড়া যদি বারবার শিশুর সামনে ঘটে, তাহলে সে নিরাপত্তাহীনতা, ভয়, অপরাধবোধ বা রাগ নিয়ে বড় হতে পারে। তাই পরিবারের সম্পর্ক শুধু বড়দের ব্যক্তিগত বিষয় নয়; এটি শিশুর বিকাশের পরিবেশও তৈরি করে।

মানুষের সম্পর্ক বোঝাতে দার্শনিক আর্থার সোপেনহাওয়ার যে 'পর্কুপাইন ডিলেমা'-র রূপক দিয়েছিলেন, তা খুব অর্থবহ। শীতের সময় পর্কুপাইনরা কাছাকাছি আসে উষ্ণতার জন্য, কিন্তু খুব কাছে এলে একে অন্যের কাঁটায় আহত হয়। মানুষের সম্পর্কেও ঘনিষ্ঠতা দরকার, কিন্তু ব্যক্তিগত সীমা ও নিরাপদ দূরত্ব না থাকলে সেই ঘনিষ্ঠতাই আঘাতের কারণ হতে পারে।

দাম্পত্য সম্পর্কে ভালোবাসা যেমন দরকার, তেমনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্মান এবং সীমারেখাও দরকার। একজন মানুষ অন্যজনের মালিক নয়। বিয়ে বা সম্পর্কের নামে কাউকে নিয়ন্ত্রণ করা, তার ব্যক্তিগত জীবনকে অবজ্ঞা করা, তার ফোন, বন্ধুত্ব বা সিদ্ধান্তের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করা—এসব আচরণ অশান্তির জন্ম দেয়। শিশুরা এগুলো দেখে সম্পর্কের ভুল ধারণা শেখে।

যে পরিবারে সন্তান আছে, সেখানে বাবা-মায়ের একটি নীরব চুক্তি দরকার: মতভেদ থাকবে, কিন্তু শিশুর সামনে অপমান, চিৎকার, ভয় দেখানো বা সহিংসতা নয়। সমস্যা হলে আলাদা সময়ে, শান্তভাবে, নির্দিষ্ট বিষয়ে কথা বলতে হবে। 'তুমি সবসময়' বা 'তুমি কখনো' ধরনের আক্রমণ না করে, 'এই কাজটি হলে আমার অসুবিধা হয়'—এভাবে কথা বললে সংঘাত কমে।

মারপিট, হুমকি, নিয়মিত অপমান বা মানসিক নির্যাতনকে কখনো স্বাভাবিক পারিবারিক ঝগড়া হিসেবে দেখা উচিত নয়। এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা, বিশ্বস্ত আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্য এবং প্রয়োজনে আইনগত বা পেশাদার সহায়তা জরুরি। শিশুর ভালোর জন্য কখনো কখনো দূরত্ব, কাউন্সেলিং বা কঠিন সিদ্ধান্তও দরকার হতে পারে।

সন্তানের সামনে বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো নিরাপদ আবহ তৈরি করা। শিশুকে বোঝাতে হবে, বড়দের মতভেদ তার দোষ নয়। পরিবারে মতভেদ থাকলেও ভালোবাসা, নিয়ম, শ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা যেন অটুট থাকে—এটাই সুস্থ বেড়ে ওঠার ভিত্তি।

অধ্যায় ৩: ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য—ডিপ্রেশন থেকে দূরে থাকার পথ

ছাত্রজীবনে মানসিক চাপ নতুন কিছু নয়, কিন্তু বর্তমান সময়ে পড়াশোনার চাপ, প্রতিযোগিতা, মোবাইল-নির্ভর জীবন, একাকীত্ব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়—এসব একসঙ্গে মিলে অনেক ছাত্রছাত্রীকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। মানসিক স্বাস্থ্যকে তাই আলাদা কোনো বিলাসিতা ভাবা ভুল; এটি শেখা, সম্পর্ক, আত্মবিশ্বাস এবং জীবনযাপনের ভিত্তি।

মানসিক সুস্থতার প্রথম ভিত্তি হলো নিয়মিত শরীরচর্চা। হাঁটা, দৌড়, ফুটবল, সাঁতার, সাইকেল, যোগব্যায়াম বা অন্য কোনো খেলা—যেটাই হোক, শরীরকে নিয়মিত নড়াতে হবে। ঘাম ঝরানো ব্যায়াম শুধু শরীর শক্ত করে না; এটি মনোযোগ, ঘুম, মেজাজ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

দ্বিতীয় ভিত্তি হলো খাদ্যাভ্যাস। ঘরের খাবার, শাক-সবজি, ফল, ডাল, মাছ বা অন্য প্রোটিন, পর্যাপ্ত জল এবং সামগ্রিকভাবে পুষ্টিকর খাদ্য শিশুর মস্তিষ্কের জন্য জরুরি। ওমেগা-৩ বা ফিশ অয়েলের মতো সম্পূরক নিয়ে কথা উঠতে পারে, কিন্তু কোনো সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার আগে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

তৃতীয় ভিত্তি হলো ঘুম। আট ঘণ্টার গভীর ঘুম ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুমের সময় মস্তিষ্ক সারাদিনের শেখা বিষয়গুলো সাজায়, স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত করে এবং পরের দিনের মনোযোগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। রাত জেগে পড়া বা মোবাইল ব্যবহার করে ঘুম নষ্ট করা দীর্ঘমেয়াদে শেখার ক্ষতি করে।

চতুর্থ ভিত্তি হলো মনকে শান্ত করার অনুশীলন। প্রাণায়াম, সচেতন শ্বাস, প্রার্থনা, ধ্যান, জার্নাল লেখা বা নিরিবিলি হাঁটা—যে পদ্ধতিই হোক, শিশুকে নিজের চিন্তা লক্ষ্য করতে শেখাতে হবে। এতে অস্থিরতা কমে এবং রাগ, ভয় বা হতাশা সামলানোর ভাষা তৈরি হয়।

মোবাইল, ভিডিও গেম, অতিরিক্ত মিষ্টি, পর্নোগ্রাফি বা দ্রুত আনন্দ দেওয়া যেকোনো অভ্যাস আসক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলোর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করে শুধু নিষেধাজ্ঞা দিলেই চলবে না; শিশুর জীবনে বিকল্প আনন্দ তৈরি করতে হবে—খেলা, বন্ধু, গল্প, সংগীত, সৃজনশীল কাজ, ছোট দায়িত্ব এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা।

ডিপ্রেশনের পেছনে অনেক চিকিৎসাগত ও সামাজিক কারণ থাকতে পারে। তবে সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ক নেতিবাচক সংকেত খুব দ্রুত ধরে, কারণ বিপদ শনাক্ত করা আমাদের বিবর্তনের অংশ। খেলাধুলা, ঘুম, সামাজিক সম্পর্ক ও অর্থপূর্ণ কাজের অভাব থাকলে এই নেতিবাচক চিন্তা আরও বাড়তে পারে। তখন ছাত্রছাত্রী মনে করতে পারে, ‘আমি পারব না’, ‘আমার ভবিষ্যৎ নেই’, বা ‘সব শেষ।’

কিছু লক্ষণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে: নিয়মিত ক্লাস বা কাজ এড়িয়ে যাওয়া, ঘুমের বড় পরিবর্তন, খাওয়ার রুচি কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া, আগে যে কাজ ভালো লাগত তাতে আগ্রহ হারানো, অকারণে রেগে যাওয়া, বাস্তবতা-বিভ্রান্তি, হ্যালুসিনেশন, আত্মহানির কথা বলা বা জীবন নিয়ে চরম হতাশা প্রকাশ করা। এগুলো দেখা দিলে পরিবারকে দ্রুত পেশাদার সাহায্য নিতে হবে।

পজিটিভ চিন্তা মানে সমস্যা নেই বলে ভান করা নয়। বরং সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়েও নিজের করণীয় খুঁজে পাওয়া। স্টোইক দর্শন আমাদের শেখায়—কোনটি আমার নিয়ন্ত্রণে, আর কোনটি নয়, তা আলাদা করতে। বৌদ্ধ ধ্যান শেখায়—চিন্তাকে চিন্তা হিসেবে পর্যবেক্ষণ করতে। আবার সাহিত্য ও দর্শন শেখায়—জীবনে অর্থ নিজেকেও তৈরি করতে হয়।

পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হলে সেটি কষ্টের হতে পারে, কিন্তু জীবনের শেষ কথা নয়। চাকরির বাজার, উচ্চশিক্ষা ও পেশার পথ বদলাচ্ছে; শুধু নম্বর নয়, দক্ষতা, শেখার ক্ষমতা, যোগাযোগ, প্রযুক্তি-জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং অধ্যবসায়ও গুরুত্বপূর্ণ। একটি ফলাফলকে তথ্য হিসেবে দেখা উচিত—কোথায় উন্নতি দরকার তা বোঝার সুযোগ হিসেবে, নিজের মূল্য নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে নয়।

অধ্যায় ৪: কেউ মেধাবী হয়ে জন্মায় না—পরিবেশ, গাইডেন্স ও শেখার সোপান

শিশুর মেধা নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক ভুল ধারণা আছে। অনেকেই ভাবেন, কেউ জন্মগতভাবে খুব মেধাবী, কেউ জন্মগতভাবে দুর্বল। বাস্তবে জন্মগত পার্থক্য থাকলেও শিশুর শেখার ক্ষমতা গড়ে ওঠে পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, ভাষা, প্রশ্ন, খেলা, শরীরচর্চা এবং সঠিক গাইডেন্সের মাধ্যমে।

মানুষের মস্তিষ্ক জন্মের সময় অসম্পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে আসে। জীবনের প্রথম কয়েক বছরে ভাষা, স্পর্শ, দৃষ্টি, শব্দ, আবেগ এবং সম্পর্কের অভিজ্ঞতা নিউরনের মধ্যে দ্রুত সংযোগ তৈরি করে। শিশু যত বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নিরাপদ অভিজ্ঞতা পায়, তার মস্তিষ্ক তত বেশি শেখার রাস্তা তৈরি করে।

শিশু যখন কথা শোনে, প্রশ্ন করে, গান শেখে, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, ফুটবল খেলে, অঙ্কের সমস্যায় আটকে যায়, আবার চেষ্টা করে—প্রতিটি কাজ তার মস্তিষ্কে নতুন

সংযোগ তৈরি করে। তাই পড়াশোনা শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; শেখা হলো জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ ঘটানো।

অতিরিক্ত টিউশন এবং মুখস্থনির্ভর শিক্ষা অনেক সময় এই সংযোগ তৈরির সুযোগ কমিয়ে দেয়। শিশু যদি সারাদিন শুধু নোট মুখস্থ করে, তাহলে সে ধারণাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে শেখে না। বাজারে ডিসকাউন্ট দেখলে শতাংশের ব্যবহার, রান্নার সময় অনুপাত, খেলায় গতি ও কোণ, গল্পে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব—এসবের সঙ্গে পড়ার বিষয় যুক্ত না হলে শেখা অগভীর থেকে যায়।

শিশুর মেধা বাড়াতে তাকে বহু ধরনের অভিজ্ঞতা দিতে হবে: মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ কথোপকথন, ভালো গল্পের বই, কৌতূহল জাগানো বিজ্ঞান পরীক্ষা, মাপজোক, হাতের কাজ, সংগীত, নাটক, খেলাধুলা এবং কঠিন কিন্তু আনন্দদায়ক সমস্যা। একাধিক ভাষা শেখা, বিশেষ করে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজির সংযোগ তৈরি করা, চিন্তাকে আরও নমনীয় করতে পারে।

শিক্ষকের আসল কাজ শুধু উত্তর দেওয়া নয়; শিশুকে প্রশ্ন করতে শেখানো। যে শিশু প্রশ্ন করতে শেখে, সে উত্তর খুঁজতেও শেখে। এই স্বশিক্ষার অভ্যাস ক্লাসের পরীক্ষার বাইরে ব্যবসা, প্রযুক্তি, গবেষণা, শিল্প—সব ক্ষেত্রেই দরকার।

অভিভাবকদের মনে রাখতে হবে, ৩ থেকে ১৬ বছরের সময়টিই শিশুর শেখার অভ্যাস গড়ার গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে কৌতূহল মেরে ফেললে পরে ডিগ্রি থাকলেও শেখার আনন্দ ফিরে পাওয়া কঠিন হয়। আর কৌতূহল বাঁচিয়ে রাখতে পারলে শিশু নিজেই শেখার পথ খুঁজে নিতে পারে।

অধ্যায় ৫: বাঙালীদের অতীত খাদ্যাভ্যাস ও আজকের শিক্ষা

আমাদের আগের প্রজন্মের খাদ্যাভ্যাসের দিকে তাকালে একটি বড় শিক্ষা পাওয়া যায়: তারা অনেক বেশি ঘরের, ঋতুভিত্তিক এবং কম প্রক্রিয়াজাত খাবার খেতেন। গ্রামের বাড়িতে উঠোনে শাক-সবজি হত, পুকুরের মাছ ছিল, ভাতের সঙ্গে ডাল, শাক, মাছ, ঘরে বানানো তরকারি এবং পরিমিত ঘি বা সর্ষের তেল ছিল দৈনন্দিন খাবারের অংশ।

বর্তমানে শহুরে জীবনে খাদ্যাভ্যাস অনেক বদলে গেছে। সাদা চাল, অতিরিক্ত আলু-ভিত্তিক খাবার, রিফাইন্ড তেল, বাজারি মাংস, অতিরিক্ত মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাবার, ফাস্ট ফুড এবং কম শাক-সবজি—এসব ধীরে ধীরে পরিবারের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। শিশুদের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে শক্তি, মনোযোগ, ওজন, হরমোনাল ভারসাম্য এবং খেলার ক্ষমতার ওপর।

আগের দিনে মোটা লাল চাল বা কম পালিশ করা চাল বেশি ব্যবহার হত। এতে আঁশ বা ফাইবার তুলনামূলক বেশি থাকে। শাক ছিল খাদ্যের একটি বড় অংশ—লাল শাক, পুঁই, কচু, লাউ, কলমি, পাটশাক, কুমড়োশাক ইত্যাদি। আজ অনেক পরিবারে শাক-সবজি কমে গিয়ে ভাত-আলু-মাংস বা ফাস্ট ফুড বেশি হয়েছে। এই পরিবর্তন শিশুদের খাদ্যগঠনে বড় ঘাটতি তৈরি করে।

তেলের ক্ষেত্রেও সতর্কতা দরকার। আগের ঘানির সর্ষের তেল, পরিমিত ঘি এবং ঘরের রান্না আজকের অতিরিক্ত রিফাইন্ড তেল ও বারবার গরম করা তেলের তুলনায় অনেক ভিন্ন খাদ্যসংস্কৃতি তৈরি করত। কোনো তেলই সীমাহীন ভালো নয়; বরং তেলের পরিমাণ, রান্নার ধরন এবং সামগ্রিক খাদ্যাভ্যাসই আসল।

মাছ, ডাল, ডিম, দুধ বা অন্য প্রোটিন শিশুর বৃদ্ধির জন্য দরকার। কিন্তু প্রোটিনের উৎস, রান্নার মান এবং বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মাংস খাওয়ালেই পুষ্টি সম্পূর্ণ হয় না; শাক-সবজি, ডাল, ফল, জল এবং ঘরের নিয়মিত খাবারও সমান জরুরি।

বাংলা সাহিত্যেও প্রাচীন খাদ্যসংস্কৃতির যে ছবি পাওয়া যায়, সেখানে নানা ধরনের শাক, ডাল, মাছের পাতলা ঝোল, ঘরের মশলা এবং ঋতুর উপকরণ দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, বাঙালির রান্না শুধু স্বাদের নয়; বৈচিত্র্য ও সামঞ্জস্যেরও ঐতিহ্য ছিল।

অভিভাবকদের জন্য সহজ নীতি হলো: শিশুকে ঘরের খাবারের স্বাদে অভ্যস্ত করুন। সপ্তাহে কতবার বাইরে খাওয়া হবে, কতটা মিষ্টি বা প্যাকেটজাত খাবার চলবে, প্রতিদিন শাক-সবজি থাকবে কি না—এসব পরিবারের সিদ্ধান্ত। ছোটবেলা থেকেই ভালো খাদ্যাভ্যাস গড়লে পরের জীবনে স্বাস্থ্য, পড়াশোনা ও মনোযোগ—সবই উপকৃত হয়।

অধ্যায় ৬: অ্যাক্টিভ ম্যাথ ও স্টোরিটেলিং—সক্রিয় গণিত শিক্ষা কী?

চার থেকে নয় বছরের শিশুরা বিমূর্ত নিয়মের চেয়ে বাস্তব কাজের মাধ্যমে দ্রুত শেখে। তাই অঙ্ক শেখানোর সময় শুধু বইয়ের প্রশ্নে আটকে থাকলে চলবে না; বাজার করা, রান্না, মাপজোক, টাকা-পয়সার হিসাব, খেলনা সাজানো, ব্লক দিয়ে ঘর বানানো, ঘড়ির সময় দেখা—এসবের মধ্যে অঙ্কের ধারণা ঢুকিয়ে দিতে হবে। এটিই অ্যাক্টিভ ম্যাথ বা সক্রিয় গণিত শিক্ষা।

অঙ্ক আসলে জীবন থেকে আলাদা কোনো রহস্যময় বিষয় নয়। শিশুকে যদি বলা হয়, ‘তিনটি আপেল আছে, আরও দুটি আনলে মোট কত?’—সে অঙ্ককে স্পর্শ করতে পারে। যদি মাপার ফিতা দিয়ে টেবিলের দৈর্ঘ্য মাপে, রান্নায় এক কাপ ডাল ও দুই কাপ জল ব্যবহার

করে, বা দোকানদারি খেলায় টাকা ফেরত দেয়—তাহলে সংখ্যা তার কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

জ্যামিতির প্রাথমিক ধারণাও খেলায় শেখানো যায়। গোল, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, লম্বা-ছোট, ভারী-হালকা, ভেতর-বাইর, উপরে-নিচে—এসব শব্দ দিয়ে শিশুর স্থানিক ধারণা তৈরি হয়। ব্লক, কাগজ কাটা, পাজল, বোর্ড গেম এবং দৈনন্দিন বস্তু ব্যবহার করে এগুলো শেখানো যায়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্টোরিটেলিং। গল্প শুনতে এবং গল্প বলতে শেখা শিশুর ভাষা, স্মৃতি, কল্পনা এবং আবেগ বোঝার ক্ষমতা বাড়ায়। একটি গল্পের শুরু, মাঝ, শেষ; চরিত্রের ইচ্ছা; সমস্যা; সমাধান—এসব বোঝা আসলে চিন্তাকে সংগঠিত করার অনুশীলন।

বাংলা ও ইংরেজি—দুটি ভাষাতেই শিশুকে গল্প শুনতে ও বলতে উৎসাহ দিতে হবে। মাতৃভাষায় গভীর বোঝাপড়া তৈরি হয়, আর ইংরেজি তাকে বৃহত্তর জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশের দরজা খুলে দেয়। একটি ভাষাকে অন্যটির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো নয়; বরং দুটিকে সহযোগী করে শেখানোই ভালো।

অভিভাবকেরা বাড়িতে সহজ রুটিন করতে পারেন: প্রতিদিন দশ মিনিট গল্প পড়া, শিশুকে গল্পের সারাংশ বলতে বলা, বাজারের হিসাব করতে দেওয়া, রান্নার মাপ বুঝতে দেওয়া, ঘরের জিনিস দিয়ে জ্যামিতির আকার বানানো, এবং ভুল করলে ধমক না দিয়ে জিজ্ঞেস করা—'তুমি কীভাবে ভাবলে?' এই প্রশ্নই শেখার দরজা খুলে দেয়।

অধ্যায় ৭: বাচ্চাদের অঙ্ক শেখার আসল পথ

অঙ্ককে অনেক শিশু ভয় পায়, কারণ তারা অঙ্ককে শুধু সূত্র, খাতা এবং পরীক্ষার নম্বর হিসেবে দেখে। কিন্তু অঙ্কের আসল কাজ হলো বাস্তব সমস্যাকে সরল ভাষায়, চিহ্নে বা মডেলে প্রকাশ করা। অর্থাৎ অঙ্ক প্রথমে ভাষা, তারপর অপারেশন।

একটি অঙ্কের সমস্যায় সাধারণত দুটি ধাপ থাকে। প্রথম ধাপ হলো ভাষান্তর: কথার সমস্যাকে অঙ্কের ভাষায় আনা। কোন তথ্য দেওয়া আছে, কী জানতে চাওয়া হচ্ছে, কোন সম্পর্ক কাজ করছে—এসব বোঝা। দ্বিতীয় ধাপ হলো অপারেশন: যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, শতাংশ, ভগ্নাংশ, সমীকরণ বা অন্য টুল ব্যবহার করে সমাধান করা।

অনেক শিক্ষার্থী দ্বিতীয় ধাপটাকেই অঙ্ক মনে করে। তারা সূত্র মুখস্থ করে, কিন্তু সমস্যার ভাষা বুঝতে শেখে না। ফলে নতুন ধরনের প্রশ্ন এলেই তারা আটকে যায়। তাই ছোটবেলা থেকেই শিশুকে সমস্যার গল্প পড়ে নিজের ভাষায় বলতে, ছবি আঁকতে, টেবিল বানাতে বা বাস্তব জিনিস দিয়ে মডেল করতে শেখাতে হবে।

মেন্টাল ম্যাথ বা মনে মনে হিসাব মনোযোগ বাড়ানোর ভালো অনুশীলন। তবে এটিকে আতঙ্কের বিষয় বানানো যাবে না। প্রতিদিন অল্প সময়ে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের অনুশীলন করলে শিশুর সংখ্যা-অনুভূতি তৈরি হয় এবং পরীক্ষায় ভুল কমে।

শিশু যেখানে ভুল করছে, সেটিই শেখার সবচেয়ে মূল্যবান জায়গা। ভুল মানে বোকামি নয়; ভুল মানে চিন্তার পথ কোথায় ভেঙেছে তা বোঝার সুযোগ। শিক্ষক বা অভিভাবকের কাজ হলো ভুলের কারণ খুঁজতে সাহায্য করা—ভাষা বোঝেনি, ধাপ ভুলেছে, হিসাবের অসাবধানতা, নাকি ধারণা পরিষ্কার নয়?

অগ্রসর শিশুদের জন্য ক্লাসের বইয়ের বাইরে চ্যালেঞ্জ দরকার। কঠিন সমস্যা, পাজল, বাস্তব জীবনের হিসাব, বিজ্ঞান প্রকল্প, কোডিং দিয়ে অঙ্ক করা—এসব তাদের চিন্তাকে বড় করে। অঙ্কে ভালো নম্বর পাওয়া এবং অঙ্ক সত্যিই বোঝা এক জিনিস নয়; দুটোকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

অধ্যায় ৮: ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য ভাষা-নির্দেশ

বাংলা মাধ্যম বনাম ইংরেজি মাধ্যম নিয়ে অকারণ দ্বন্দ্ব ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি করে। কোনো মাধ্যমই নিজে নিজে মানুষকে বড় বা ছোট করে না। আসল বিষয় হলো—শিশু কত গভীরভাবে বুঝতে পারছে, কত পরিষ্কারভাবে বলতে পারছে, এবং নতুন জ্ঞানকে নিজের ভাষায় সাজাতে পারছে কি না।

প্রতিটি বাঙালি ছাত্রছাত্রীর বাংলা ও ইংরেজি—দুটি ভাষাতেই দক্ষ হওয়া উচিত। মাতৃভাষা শিশুর চিন্তার গভীরতা তৈরি করে; ইংরেজি তাকে বিশ্বজ্ঞান, উচ্চশিক্ষা, প্রযুক্তি ও পেশাগত যোগাযোগের সুযোগ দেয়। একটিকে বেছে নিয়ে অন্যটিকে অবহেলা করলে শেখার পরিধি কমে যায়।

যে শিশু বাংলা মাধ্যমের, তার ইংরেজি শব্দভান্ডার ও টার্ম শেখা জরুরি। আবার যে শিশু ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে, তার বাংলা বোঝা ও বাংলায় ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও জরুরি। ঘর, সমাজ, সংস্কৃতি ও গভীর আবেগের ভাষা যদি দুর্বল হয়, তবে চিন্তার মাটি দুর্বল হয়ে যায়।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের উচিত ভাষা নিয়ে অহংকার নয়, সহযোগিতা শেখানো। ভুল করলে সংশোধন করতে হবে, কিন্তু অপমান করা যাবে না। ‘তুমি পারবে, এইভাবে শেখো’—এই মনোভাবই ভাষা শেখার জন্য দরকার।

বিশ্বের বহু উন্নত দেশ নিজস্ব ভাষায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা করে, আবার আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষাও শেখে। আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত দ্বিভাষিক শক্তি তৈরি করা—মাতৃভাষায় গভীরতা, ইংরেজিতে বিস্তার।

অধ্যায় ৯: অন্য বাচ্চার সঙ্গে নিজের বাচ্চার তুলনা বন্ধ করুন

অনেক অভিভাবক ভালো উদ্দেশ্যে সন্তানকে অন্য বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করেন। তারা ভাবেন এতে সন্তান উৎসাহিত হবে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তুলনা শিশুর আত্মসম্মান কমায়, পড়াশোনার আনন্দ নষ্ট করে এবং নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে।

প্রতিটি শিশুর শেখার গতি, আগ্রহ, শক্তি ও দুর্বলতা আলাদা। কেউ অঙ্কে দ্রুত, কেউ ভাষায়; কেউ খেলায়, কেউ সংগীতে; কেউ ধীরে বুঝে কিন্তু গভীরভাবে বোঝে। অন্যের নম্বর দিয়ে নিজের সন্তানের মূল্য নির্ধারণ করলে শিশুটি শেখে—'আমি যথেষ্ট নই'। এই বিশ্বাস দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক।

অভিভাবকের মনোযোগ হওয়া উচিত শিশুর শেখার দক্ষতার দিকে: সে কি প্রশ্ন করছে? ভুল থেকে শিখছে? নিজের ভাষায় বলতে পারছে? নতুন বিষয় নিয়ে কৌতূহলী? সময়মতো কাজ শুরু করছে? মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে? এগুলোই ভবিষ্যতের আসল সূচক।

স্কুলের নম্বর দরকার, কিন্তু নম্বর জীবন নয়। অতিরিক্ত অ্যাসাইনমেন্ট, অকারণ টিউশন এবং '৯০ শতাংশ না পেলে ভবিষ্যৎ নেই' ধরনের ভয় শিশুকে যন্ত্রে পরিণত করে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ঘুম, শিল্প, বন্ধু এবং পরিবার—এসবও শিশুর বিকাশের অংশ।

তুলনার বদলে অভিভাবক বলতে পারেন: 'গতবারের চেয়ে এবার কোথায় ভালো করেছ?', 'কোথায় আটকে গেছ?', 'আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' শিশুকে অন্যের বিরুদ্ধে নয়, নিজের গতকালের সঙ্গে তুলনা করতে শেখান।

অধ্যায় ১০: শিশুদের কোডিং শেখানো—কখন, কীভাবে, কেন

কোডিং এখন শুধু কম্পিউটার সায়েন্সের বিষয় নয়; এটি সমস্যা ভেঙে দেখা, ধাপে ধাপে ভাবা এবং নিজের ধারণাকে কাজের রূপ দেওয়ার একটি ভাষা। তবে শিশুদের কোডিং শেখানো মানে অল্প বয়সে পেশাদার প্রোগ্রামার বানানো নয়। উদ্দেশ্য হলো যুক্তি, সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করা।

প্রাথমিক স্তরে ভিজ্যুয়াল ব্লক-কোডিং বা খেলাধুলার মাধ্যমে প্রোগ্রামিংয়ের ধারণা শেখানো যায়। শিশু ছোট গেম বানায়, চরিত্র নড়ায়, শব্দ যোগ করে, নিয়ম বানায়—এসবের মধ্যে সে ক্রম, শর্ত, পুনরাবৃত্তি এবং কারণ-ফল সম্পর্ক বোঝে।

ক্লাস ৫ থেকে ধীরে ধীরে টেক্সট-ভিত্তিক প্রোগ্রামিং, যেমন পাইথন, অঙ্ক ও বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। গ্রাফ আঁকা, গুণের টেবিল, ভগ্নাংশ, গতি, ডেটা সাজানো—এসব কোড দিয়ে করলে শিশুর অঙ্ক ও যুক্তি আরও পরিষ্কার হয়।

কোডিং শেখার ক্ষেত্রে মেন্টর সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিশুকে নিজে চেষ্টা করতেই হবে। কপি-পেস্ট করে কোড চালানো শেখা নয়; কোড কেন কাজ করল, কোথায় ভুল হল, কীভাবে ডিবাগ করতে হয়—এসব বোঝাই আসল।

অভিভাবকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: কোডিং যেন আরেকটি চাপের টিউশন না হয়। শিশুর ঘুম, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও মৌলিক পড়াশোনা বাদ দিয়ে কোডিং করানো উচিত নয়। শরীর ও মন ক্লান্ত থাকলে প্রযুক্তি শেখাও অগভীর হয়ে যায়।

শিশুকে নিরাপদ ও মানসম্মত অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার করতে শেখানো যায়, কিন্তু সামাজিক-মাধ্যমের ভিড় বা অপ্রয়োজনীয় স্ক্রিনটাইম থেকে দূরে রাখতে হবে। লক্ষ্য হলো টুল ব্যবহার করে তৈরি করা—শুধু স্ক্রিনে ভেসে থাকা নয়।

অধ্যায় ১১: পোমোডোরো টেকনিকের সাহায্যে পড়াশোনায় মনোযোগ

অনেক ছাত্রছাত্রী পড়তে বসে শুরু করতে পারে না। কাজ জমে যায়, তারপর পরীক্ষার আগে চাপ বাড়ে। এই অভ্যাসকে প্রোক্রাস্টিনেশন বা কাজ ফেলে রাখা বলা হয়। এটি আলস্যের সমস্যা মাত্র নয়; অনেক সময় কাজকে বড়, ভয়ংকর বা আনন্দহীন মনে হওয়ার ফল।

আমাদের মস্তিষ্ক দ্রুত পুরস্কার পছন্দ করে। মোবাইল, গেম বা ছোট ভিডিও দ্রুত আনন্দ দেয়; কিন্তু পড়াশোনার ফল দূরে। তাই মস্তিষ্ক সহজ পথে যেতে চায়। এই জায়গায় পোমোডোরো পদ্ধতি কাজে লাগতে পারে, কারণ এটি বড় কাজকে ছোট অংশে ভাগ করে।

পদ্ধতিটি সহজ: একটি ছোট লক্ষ্য ঠিক করো, ২৫ মিনিট শুধু সেই কাজ করো, তারপর ৫ মিনিট বিরতি নাও। চারটি চক্রের পর একটু বড় বিরতি নেওয়া যায়। এই ছোট সময়ের কাঠামো মস্তিষ্ককে বলে—কাজটি অসীম নয়; শুরু করলেই শেষের দিকে যাওয়া যাবে।

পোমোডোরোর সময় মোবাইল দূরে রাখতে হবে, নোটিফিকেশন বন্ধ রাখতে হবে, এবং কাজের লক্ষ্য স্পষ্ট হতে হবে। ‘অঙ্ক পড়ব’ বললে মন ঘুরে যায়; বরং ‘আজ ভগ্নাংশের পাঁচটি সমস্যা করব’ বা ‘দুই পৃষ্ঠা পড়ে পাঁচ লাইনের সারাংশ লিখব’—এভাবে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হবে।

বিরতির সময় স্ক্রল করা ভালো বিরতি নয়। বরং দাঁড়িয়ে হাঁটা, জল খাওয়া, চোখ বিশ্রাম দেওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন বা হালকা স্ট্রেচিং করা ভালো। এতে মস্তিষ্ক আবার মনোযোগের জন্য প্রস্তুত হয়।

পোমোডোরো পদ্ধতি ম্যাজিক নয়; এটি অভ্যাস তৈরি করার একটি টুল। নিয়মিত ব্যবহার করলে শিশুরা বুঝতে শেখে—মনোযোগ জন্মগত গুণ নয়, অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে তোলা যায়।

মনোযোগী পড়ার সহজ চক্র

লম্বা চাপের বদলে ছোট, নিয়মিত এবং মাপা পড়াশোনা বেশি কার্যকর।

১. লক্ষ্য ঠিক করা
একটি ছোট কাজ: দুই পৃষ্ঠা পড়া, পাঁচটি অঙ্ক, বা একটি সারাংশ।

২. ২৫ মিনিট ফোকাস
মোবাইল দূরে রেখে শুধু এক কাজ।

৩. ৫ মিনিট বিরতি
হাঁটা, জল খাওয়া, চোখ বিশ্রাম; স্ক্রল নয়।

৪. ছোট রিভিউ
কী শিখলাম, কোথায় আটকালাম—নিজেকে বলো।

অধ্যায় ১২: বাচ্চাদের অ্যাসাইনমেন্ট পরীক্ষা করা

অ্যাসাইনমেন্ট পরীক্ষা করা শুধু ভুল ধরার কাজ নয়; এটি শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশুর কাজ দেখে বোঝা যায়, সে ধারণা বুঝেছে কি না, কোথায় ভুল করছে, নিজের ভাষায় লিখতে পারছে কি না, এবং সমস্যার সমাধানে কী ধরনের চিন্তা ব্যবহার করছে।

সব অ্যাসাইনমেন্ট একা একজন শিক্ষকের পক্ষে পরীক্ষা করা কঠিন হতে পারে। তাই দুটি পদ্ধতি কাজে লাগে: শিক্ষকের নির্বাচিত পর্যালোচনা এবং সহপাঠীদের মধ্যে পিয়ার

রিভিউ। এগুলো ঠিকভাবে করলে শিশুরা শুধু নিজের ভুল নয়, অন্যের ভুল থেকেও শিখতে পারে।

যে ছাত্র একটি বিষয় ভালো বুঝেছে, তাকে অন্যকে বোঝাতে দিলে তার নিজের বোঝাপড়াও গভীর হয়। ফাইনম্যান পদ্ধতির মূল কথাও এটাই—যদি তুমি সহজ ভাষায় বোঝাতে না পারো, তাহলে বিষয়টি পুরোপুরি বোঝোনি।

তবে পিয়ার রিভিউতে অপমান বা তুলনা চলবে না। নিয়ম হতে পারে: প্রথমে ভালো দিক বলো, তারপর একটি উন্নতির জায়গা বলো, শেষে কীভাবে ঠিক করা যায় তা বলো। এতে দলগত শেখা, সহানুভূতি এবং নেতৃত্বের গুণ তৈরি হয়।

অ্যাসাইনমেন্টের লক্ষ্য নম্বর নয়, বোঝা। যদি শিশুরা বুঝে যায় যে ভুল হলেই ধমক নয়, বরং শেখার সুযোগ—তাহলে তারা কঠিন কাজেও হাত দিতে সাহস পায়।

অধ্যায় ১৩: অভিভাবকরা কেন নিয়ন্ত্রণ হারান এবং কীভাবে সম্পর্ক ফিরবে

অনেক পরিবারে দেখা যায়, শিশু ছোট থাকলে বাবা-মায়ের কথা শোনে, কিন্তু বড় হতে হতে পড়াশোনা, মোবাইল, বন্ধু বা স্বাধীনতা নিয়ে সংঘাত বাড়ে। এর একটি বড় কারণ হলো ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনাকে চাপ, ভয় বা শাস্তির সঙ্গে যুক্ত করা। শিশু তখন পড়াকে নিজের আনন্দ হিসেবে নয়, বড়দের খুশি করার কাজ হিসেবে দেখে।

মোবাইল আসক্তির অনেক ক্ষেত্রেই এটি পালানোর পথ। যে শিশু সারাদিন ধমক, তুলনা বা ব্যর্থতার ভয়ে থাকে, সে দ্রুত আনন্দ দেওয়া স্ক্রিনে আশ্রয় খোঁজে। তাই শুধু 'মোবাইল ছাড়ো' বললে কাজ হয় না; শিশুর জীবনে এমন কিছু ফিরিয়ে আনতে হবে যাতে সে বাস্তব আনন্দ পায়—খেলা, গল্প, বন্ধু, সৃজনশীল কাজ, পরিবারে সম্মানজনক কথা, এবং নিজের পছন্দের কাজ।

অভিভাবকের কাজ শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, দিকনির্দেশ দিয়ে স্বাধীন করে তোলা। শিশুকে শেখাতে হবে কীভাবে শিখতে হয়—প্রশ্ন করা, নোট নেওয়া, ভুল ঠিক করা, সাহায্য চাইতে জানা, সময় ভাগ করা এবং নিজের আগ্রহ আবিষ্কার করা।

একটি পুরনো গল্প এখানে প্রাসঙ্গিক। তানসেনের গুরু স্বামী হরিদাস নাকি শিষ্যকে বলেছিলেন—যদি তুমি গান শেখো শুধু নাম, যশ বা পুরস্কারের জন্য, তবে গানের আত্মা ধরতে পারবে না। গানকে ভালোবাসতে হবে গানের জন্যই। শিক্ষা নিয়েও একই কথা সত্য। শিশুকে শুধু নম্বরের জন্য পড়ালে শেখার আত্মা হারিয়ে যায়।

সম্রাট আকবরের সামনে তানসেন অসাধারণ গান গাইতেন, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন—গুরু হরিদাস গান করেন সাধনার জন্য, আর তিনি গান করেন রাজদরবারের জন্য। এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাহ্যিক পুরস্কার দরকার হলেও আসল শিক্ষা আসে ভেতরের আনন্দ ও সাধনা থেকে।

শিশুকে সেই সাধনার স্বাদ দিতে হবে। পড়া যেন তার কাছে নিজের জগৎ আবিষ্কারের পথ হয়। সে যখন ইতিহাসের গল্পে প্রশ্ন করে, বিজ্ঞান পরীক্ষায় অবাক হয়, অঙ্কের সমস্যায় লেগে থাকে, কবিতার শব্দ নিয়ে খেলে—তখন নিয়ন্ত্রণের বদলে সম্পর্ক তৈরি হয়।

অধ্যায় ১৪: "পড়া মুখস্থ মনে থাকছে না"—সমস্যার আসল কারণ

অনেক অভিভাবক বলেন, শিশুকে পড়ানো হয়, কিন্তু দুদিন পরেই সে ভুলে যায়। এই অভিযোগের ভেতরে প্রায়ই একটি বড় ভুল লুকিয়ে থাকে: শিশুকে বোঝানো হয়নি, তাকে মুখস্থ করানো হয়েছে। মুখস্থ তথ্য দ্রুত মুছে যায়, কিন্তু নিজের ভাষায় বোঝা তথ্য দীর্ঘদিন থাকে।

শিশুর মস্তিষ্ক যে ভাষায় বাড়ে, সেই ভাষায় সে সবচেয়ে গভীরভাবে বুঝতে পারে। বাঙালি শিশুর ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় ধারণা ব্যাখ্যা করলে অনেক বিষয় দ্রুত পরিষ্কার হয়। পরে সেই ধারণা ইংরেজি টার্মে প্রকাশ করা শেখানো যায়। কিন্তু প্রথমেই কঠিন জার্গন মুখস্থ করালে শিশুর মস্তিষ্ক শব্দ ধরে, অর্থ ধরে না।

শিক্ষকের নোট বা গাইডবুকের ভাষা অনেক সময় শিশুর নিজের ভাষা নয়। পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ভাষা দরকার হতে পারে, কিন্তু শেখার শুরুতে শিশুকে নিজের ভাষায় বলতে, উদাহরণ দিতে, ছবি আঁকতে, প্রশ্ন করতে এবং ভুল ভাষায় হলেও চিন্তা প্রকাশ করতে দিতে হবে।

অভিভাবকরা বাড়িতে একটি সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন: পড়ার পর শিশুকে বলুন, 'তুমি নিজের ভাষায় আমাকে বোঝাও।' সে যদি তিন থেকে পাঁচটি বাক্যে বোঝাতে পারে, তাহলে বোঝা শুরু হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে বইয়ের সঠিক শব্দ, সংজ্ঞা ও পরীক্ষার ভাষা শেখানো যায়।

যে শিশু নিজের ভাষায় উত্তর লিখতে চায়, তাকে অলস ভাবা উচিত নয়। বরং সে বুঝে লিখতে চাইছে। তাকে পরীক্ষার কাঠামো শেখাতে হবে, কিন্তু তার চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট করা যাবে না। শিক্ষা যদি শুধু মুখস্থে সীমাবদ্ধ হয়, তবে কৌতূহল মরে যায়; আর কৌতূহল মরে গেলে শেখার শক্তিও কমে যায়।

অধ্যায় ১৫: সেকেন্ড সেলফ বনাম ইনার সেলফ

শিশুরা বড়দের ভালোবাসা ও স্বীকৃতি চায়। তাই তারা অনেক সময় নিজের আসল আগ্রহের বদলে এমন পরিচয় তৈরি করে যা বাবা-মা, শিক্ষক বা সমাজ পছন্দ করবে। এই সামাজিক পরিচয়কে এখানে 'সেকেন্ড সেলফ' বলা যায়। এটি সবসময় খারাপ নয়; ভালো রোল মডেল শিশুকে উন্নতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু যদি এই পরিচয় শিশুর অন্তরের আগ্রহকে চাপা দেয়, তখন সমস্যা তৈরি হয়।

ধরা যাক, একটি শিশু সবাইকে খুশি করার জন্য বলে সে অঙ্ক ভালোবাসে, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না কোন ধরনের অঙ্ক তার ভালো লাগে। হয়তো সে আসলে গল্প বানাতে, ভিডিও সম্পাদনা করতে, খেলতে বা সংগীত শিখতে ভালোবাসে। যদি পরিবার শুধু নম্বরের পরিচয় চাপিয়ে দেয়, তবে শিশুটি নিজের ভেতরের সুর হারিয়ে ফেলতে পারে।

ইনার সেলফ হলো শিশুর ভেতরের সত্যিকারের আগ্রহ, কৌতূহল ও আনন্দের জায়গা। কেউ বিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করতে ভালোবাসে, কেউ চরিত্র তৈরি করে গল্প লিখতে, কেউ যন্ত্র খুলে দেখতে, কেউ দৌড়াতে, কেউ গান গাইতে। এই আগ্রহগুলোকে তুচ্ছ করলে শিশুর প্রাণশক্তি কমে যায়।

অভিভাবকের কাজ হলো শিশুকে নিজের আগ্রহ খুঁজতে সাহায্য করা। তাকে নানা অভিজ্ঞতার সুযোগ দিন—খেলা, বই, বিজ্ঞান পরীক্ষা, সংগীত, নাটক, আঁকা, কোডিং, রান্না, বাগান, হাতের কাজ। তারপর লক্ষ্য করুন, কোন কাজে সে সময়ের হিসাব ভুলে যায়। সেটিই তার শক্তির দরজা হতে পারে।

সেকেন্ড সেলফকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যায়। যদি শিশুর ভিডিও বানাতে ভালো লাগে, তাকে ভালো চলচ্চিত্রকারের কাজ দেখান; যদি অঙ্ক ভালো লাগে, ভালো গণিতবিদের জীবন পড়তে দিন; যদি খেলাধুলা ভালো লাগে, শৃঙ্খলাবদ্ধ খেলোয়াড়ের অনুশীলন দেখান। রোল মডেল যেন চাপ নয়, অনুপ্রেরণা হয়।

অধ্যায় ১৬: কম্পিউটার প্রোগ্রামিং স্কুল লেভেল থেকেই শেখা যায়

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখার সবচেয়ে ভালো সময় নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট: প্রোগ্রামিং শিশুকে ধাপে ধাপে চিন্তা করতে শেখায়। সমস্যা ভাঙা,

অ্যালগরিদম লেখা, ভুল খুঁজে বের করা এবং ফলাফল দেখা—এসব শেখার গভীর অভ্যাস তৈরি করে।

শিশুদের কাছে প্রোগ্রামিং বিমূর্ত ভাষা হিসেবে নয়, তৈরি করার খেলায় শুরু করা ভালো। একটি চরিত্রকে নড়ানো, ছোট গেম বানানো, অ্যানিমেশন করা, কুইজ তৈরি করা—এসবের মধ্যে শিশু নিজের সৃষ্টির আনন্দ পায়। সে দেখে, তার নির্দেশে স্ক্রিনে কিছু ঘটছে। এই দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া শেখাকে আনন্দময় করে।

ইতিহাসে অনেক প্রযুক্তিনেতার জীবনে দেখা যায়, তারা ছোটবেলায় কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স বা সমস্যার সমাধান নিয়ে গভীর আগ্রহী ছিলেন। শুধু ডিগ্রি নয়, গভীর দক্ষতা, কৌতূহল এবং দীর্ঘ অনুশীলন তাদের এগিয়ে দিয়েছে। তবে ডিগ্রিকে অবহেলা করা নয়; বরং বুঝতে হবে, ডিগ্রি তখনই শক্তিশালী হয় যখন তার সঙ্গে বাস্তব দক্ষতা যুক্ত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হলো চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান। দ্বিতীয় স্তর হলো বিষয়টি এতটা বোঝা যাতে অন্যকে শেখানো যায়। তৃতীয় স্তর হলো নতুন পণ্য, পদ্ধতি বা সমাধান তৈরি করার ক্ষমতা। প্রোগ্রামিং ছোটবেলা থেকে শেখা হলে তৃতীয় স্তরের চিন্তা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

আজকের বিজ্ঞান, ব্যবসা, গবেষণা, কৃষি, চিকিৎসা, নকশা—প্রায় সব ক্ষেত্রেই ডেটা, সিমুলেশন, অটোমেশন এবং সফটওয়্যার ব্যবহার হচ্ছে। তাই ‘আমি কোর ইঞ্জিনিয়ারিং করব, প্রোগ্রামিং জানার দরকার নেই’—এই ধারণা পুরোনো। যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি বোঝা এবং অন্তত বেসিক কোডিং জানা ভবিষ্যতের জন্য দরকারি।

তবে প্রোগ্রামিং শেখাকে পরীক্ষার আরেকটি বোঝা বানালে লাভ নেই। শিশুকে প্রজেক্ট করতে দিন: আবহাওয়ার ডেটা সাজানো, ব্যয় হিসাবের টেবিল বানানো, ছোট গেম তৈরি, অঙ্কের গ্রাফ আঁকা, বা রোবটিক্সের সহজ মডেল। সমস্যা বাস্তব হলে শেখা গভীর হয়।

সাফল্যের রসায়ন শুধু প্রতিভা নয়; প্যাশন এবং পারসিভিয়ারেন্স—ভালোবাসা ও লেগে থাকা। কবিতা, বিজ্ঞান, ব্যবসা, প্রোগ্রামিং, খেলাধুলা—সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘ অনুশীলন লাগে। শিশুকে সেই অনুশীলনের আনন্দ শেখাতে হবে।

অধ্যায় ১৭: বাচ্চাদের ব্রেইন ডেভেলপমেন্টে অভিভাবকের ভূমিকা

শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে পরিবার প্রথম বিদ্যালয়। জন্মের পর থেকেই কথা, স্পর্শ, চোখে চোখ রাখা, গান, গল্প, প্রতিক্রিয়া এবং নিরাপদ সম্পর্ক—এসব শিশুর মস্তিষ্কে ভাষা, আবেগ এবং সামাজিক বোঝাপড়ার ভিত্তি তৈরি করে।

ছোটবেলায় শিশুর সঙ্গে বেশি কথা বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নির্দেশ নয়—বর্ণনা, প্রশ্ন, গল্প, অনুভূতি, নতুন শব্দ, কারণ-ফল সম্পর্ক—এসব নিয়ে কথা বলুন। 'এটা করো' বলার বদলে 'এটা করলে কী হবে বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করুন। শিশুর উত্তর অসম্পূর্ণ হলেও মন দিয়ে শুনুন।

শরীরচর্চা মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ, ভারসাম্য, বল খেলা, সাঁতার, নাচ বা ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম শরীরকে সক্রিয় রাখে এবং মনোযোগ, মেজাজ ও ঘুমে সাহায্য করে। সারাদিন বসে থাকা শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

মোবাইল ও স্ক্রিনের বড় সমস্যা শুধু সময় নষ্ট নয়; শিশুর প্রতিক্রিয়া-ব্যবস্থাও দুর্বল হতে পারে। বাস্তব কথোপকথনে শিশুকে শুনতে, অপেক্ষা করতে, উত্তর দিতে, মুখভঙ্গি বুঝতে এবং নিজের কথা সাজাতে হয়। স্ক্রিনে সে দ্রুত তথ্য পায়, কিন্তু অনেক সময় তা ব্যবহার করার সামাজিক অনুশীলন পায় না।

তাই স্ক্রিনের বদলে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা নয়, সচেতন ব্যবহার দরকার। নির্দিষ্ট সময়, মানসম্মত শিক্ষাসামগ্রী, সহ-দেখা, আলোচনা এবং স্ক্রিনের বাইরে পর্যাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা—এই ভারসাম্য রাখতে হবে।

অভিভাবকের কাছে মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত: আজ আমার সন্তান কী নতুন শব্দ শুনল, কী নতুন প্রশ্ন করল, কতক্ষণ খেলল, কী বানাল, কী লিখল, কার সঙ্গে কথা বলল, এবং কোথায় আনন্দ পেল? এই প্রশ্নগুলোই ব্রেইন ডেভেলপমেন্টের দৈনন্দিন মানচিত্র।

অধ্যায় ১৮: সফলতার ৬টি অভ্যাস

শিশুদের সফলতার জন্য শুধু বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। দীর্ঘমেয়াদে যে অভ্যাসগুলো গড়ে ওঠে, সেগুলোই চরিত্র, শেখা এবং কাজের মান নির্ধারণ করে। এই অধ্যায়ে ছয়টি অভ্যাস নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রথম অভ্যাস হলো নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার দায়িত্ব নেওয়া। অজুহাত না দিয়ে শিশুকে ভাবতে শেখাতে হবে—আমি কোথায় ভুল করেছি, কীভাবে ঠিক করব, পরের বার কী বদলাব? দায়িত্ববোধ আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে না; বরং উন্নতির পথ দেখায়।

দ্বিতীয় অভ্যাস সংগঠন। দিনের কাজ, পড়ার লক্ষ্য, খেলার সময়, বিশ্রাম—এসব সাজাতে শেখা দরকার। ছোট শিশুদের জন্য ছবি-ভিত্তিক রুটিন, বড়দের জন্য লিখিত তালিকা বা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা যায়।

তৃতীয় অভ্যাস কার্যসম্পাদন। পরিকল্পনা সুন্দর হলেই হবে না; নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শুরু ও শেষ করতে হবে। ছোট কাজ দিয়ে শুরু করলে শিশু কাজ ফেলে রাখার অভ্যাস থেকে বেরোতে পারে।

চতুর্থ অভ্যাস উৎকর্ষের চেষ্টা। শুধু নম্বরের জন্য পড়া নয়, বিষয়টি সত্যিই বোঝা। একটি অধ্যায় পড়লে তার সারাংশ বলা, উদাহরণ দেওয়া, অন্য বিষয়ের সঙ্গে মিল খোঁজা—এসব উৎকর্ষের লক্ষণ।

পঞ্চম অভ্যাস অধ্যবসায়। কঠিন অঙ্ক না হলে, একবারে লেখা ভালো না হলে, বিজ্ঞান পরীক্ষা ব্যর্থ হলে—সেখানেই থেমে গেলে শেখা হবে না। অন্য পদ্ধতি খোঁজা, সাহায্য চাওয়া, আবার চেষ্টা করা—এটাই লেগে থাকার শিক্ষা।

ষষ্ঠ অভ্যাস হলো অবিরাম জ্ঞানচর্চা। স্কুলের বইয়ের বাইরে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, প্রযুক্তি, জীবনী—এসব পড়লে চিন্তা বিস্তৃত হয়। ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে এই বিস্তৃত জ্ঞানই সাহায্য করে।

সফল শেখার ৬টি অভ্যাস

দায়িত্ব
সাফল্য ও ভুল—দুটির কারণ বুঝে নিজের উন্নতির পথ খোঁজা।

সংগঠন
দিনের কাজ লিখে রাখা এবং সময়মতো শুরু করা।

কর্মসম্পাদন
পরিকল্পনাকে কাজে নামানো; অজুহাতে আটকে না থাকা।

উৎকর্ষ
শুধু পাশ নয়, বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার চেষ্টা।

অধ্যবসায়
কঠিন হলে থেমে না গিয়ে অন্য পদ্ধতিতে চেষ্টা।

জ্ঞানচর্চা
স্কুলের বইয়ের বাইরে ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ ও প্রযুক্তি পড়া।

অধ্যায় ১৯: প্রাইমারি স্কুলের শিশুদের অঙ্ক ও বিজ্ঞানে উৎসাহিত করা

প্রাইমারি স্তরে শিশুকে অঙ্ক ও বিজ্ঞানে উৎসাহিত করতে হলে প্রথমে তাকে ভয়মুক্ত করতে হবে। 'ভুল করলে বকুনি'—এই ধারণা থাকলে শিশু নতুন সমস্যা নিতে চায় না। বরং তাকে বলতে হবে, ভুল হলেই আমরা বুঝব কোথায় শেখার দরজা আছে।

মাইন্ড গেম, পাজল, মনে মনে হিসাব, আকার চিনে নেওয়া, প্যাটার্ন খোঁজা—এসব প্রাথমিক গণিতের ভালো অনুশীলন। এগুলোকে খেলার মতো করতে হবে। শিশুকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে: 'আরও কোনোভাবে করা যায়?', 'তুমি কীভাবে বুঝলে?', 'তুমি কি একটি ছবি আঁকতে পারো?'

বিজ্ঞান শেখাতে ঘরের জিনিস ব্যবহার করুন। জল কেন বাষ্প হয়, ছায়া কেন বদলে যায়, চুম্বক কী টানে, বীজ কীভাবে গাছ হয়, সাবান ফেনা করে কেন—এসব প্রশ্ন থেকেই বিজ্ঞান শুরু। শিশুকে প্রস্তুত উত্তর দেওয়ার আগে পর্যবেক্ষণ করতে দিন।

যে শিশুর অঙ্ক ভালো লাগে, তাকে ধীরে ধীরে উচ্চতর বা চ্যালেঞ্জিং সমস্যা দিতে পারেন, কিন্তু চাপ দিয়ে নয়। চ্যালেঞ্জ যেন খেলায় আমন্ত্রণের মতো হয়—'চলো দেখি তুমি এটা বের করতে পারো কি না।'

শিশুদের জীবনী পড়তে দিন। বিজ্ঞানী, খেলোয়াড়, শিল্পী, গণিতবিদ, উদ্যোক্তা—যাদের জীবন সংগ্রাম, কৌতূহল ও লেগে থাকার গল্পে ভরা, তারা শিশুদের সামনে বাস্তব রোল মডেল তৈরি করে।

সবচেয়ে বড় কথা, শিশুকে খেলার সময় দিন। যে শিশু মাঠে দৌড়ায়, দলগত খেলায় অংশ নেয়, হার-জিত সামলায়, শরীর ব্যবহার করে—সে অঙ্ক ও বিজ্ঞানের বিমূর্ত ধারণাও অনেক সময় সহজে ধরতে পারে।

অধ্যায় ২০: প্রতিদিন শরীরচর্চার গুরুত্ব

শরীরচর্চা শিশুদের জন্য অতিরিক্ত কোনো কার্যকলাপ নয়; এটি পড়াশোনার ভিত্তি। শরীর সক্রিয় না থাকলে ঘুম, মেজাজ, মনোযোগ, স্মৃতি এবং আত্মবিশ্বাস—সবই প্রভাবিত হয়। অনেক পরিবারে পড়াশোনার চাপের কারণে খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যায়; এটি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শরীরচর্চা কমে গেলে স্বাস্থ্যের ওপর চাপ পড়ে। আবার হাঁটা, জিম, সাঁতার, ফুটবল বা নিয়মিত ব্যায়ামে ফিরে এলে শরীর ও মনের শক্তি বাড়ে। শিশুরা ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষা পেলে পরের জীবনে স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাস তৈরি হয়।

শহুরে জীবনে বড় সমস্যা হলো জাঙ্ক ফুড এবং কম নড়াচড়া। শপিং মল, ফাস্ট ফুড, অতিরিক্ত তেল-মশলা, মিষ্টি পানীয় এবং প্যাকেটজাত খাবার শিশুদের কাছে সহজ আনন্দ। কিন্তু এগুলো যদি নিয়মিত খাদ্যের বড় অংশ হয়ে যায়, তবে ওজন, হরমোনাল সমস্যা, ক্লান্তি এবং মনোযোগের সমস্যা বাড়তে পারে।

অভিভাবকরা অনেক সময় বলেন, ‘শিশু ঘরের খাবার খেতে চায় না।’ কিন্তু ছোটবেলা থেকে যদি বাইরে খাবারকে পুরস্কার বানানো হয়, তবে ঘরের খাবার তার কাছে কম আকর্ষণীয় লাগতেই পারে। তাই ঘরের খাবারকে বৈচিত্র্যপূর্ণ, রঙিন ও স্বাদযুক্ত করে তুলুন; বাইরে খাবারকে নিয়মিত অভ্যাস নয়, সীমিত ব্যতিক্রম করুন।

প্রতিদিন অন্তত ৪০ থেকে ৬০ মিনিট সক্রিয় শরীরচর্চা দরকার। দৌড়ঝাঁপ, সাইকেল, সাঁতার, ফুটবল, বাস্কেটবল, নাচ, দড়ি লাফ, ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম—যা সম্ভব তা করুন। ঘরের মধ্যেও সীমিত জায়গায় স্কোয়াট, জাম্পিং, স্ট্রেচিং, ভারসাম্য অনুশীলন করা যায়।

অভিভাবকদের উচিত পড়াশোনার মতো শরীরচর্চাকেও গুরুত্ব দেওয়া। ‘বাচ্চা পড়ছে না’ বলে যত চিন্তা হয়, ‘বাচ্চা খেলছে না’ বলেও তত চিন্তা হওয়া উচিত। সুস্থ শরীর ছাড়া ভালো পড়াশোনা, ভালো ক্যারিয়ার এবং আনন্দময় জীবন—কোনোটাই সম্পূর্ণ হয় না।

শিশুর দৈনন্দিন সুস্থ রুটিন

রুটিনের লক্ষ্য শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, তাকে শক্তিশালী ও স্বাধীন লার্নার বানানো।

সকাল/বিকেল খেলা

৪০-৬০ মিনিট দৌড়ঝাঁপ, সাইকেল, সাঁতার, ফুটবল বা ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম।

ঘরের খাবার

শাক, ডাল, মাছ/ডিম/প্রোটিন, ফল ও জল; অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড কম।

ডিভাইস সীমা

মোবাইল পুরস্কার নয়; নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার।

সৃজনশীল সময়

গল্প পড়া, লেখা, আঁকা, গান, নাটক বা হাতের কাজ।

অধ্যায় ২১: কেন বাচ্চারা কবিতা লেখা শিখবে?

প্রযুক্তির যুগে অনেকেই ভাবেন কবিতা, গল্প বা শিল্প হয়তো অতিরিক্ত বিলাসিতা। বাস্তবে সৃজনশীলতা ভবিষ্যতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলোর একটি। তথ্য কম্পিউটার দ্রুত জোগাড় করতে পারে, কিন্তু নতুনভাবে দেখা, অপ্রত্যাশিত সংযোগ করা, অনুভূতি প্রকাশ করা এবং কল্পনায় ভবিষ্যৎ বানানো—এগুলো মানুষের শক্তি।

কবিতা লেখা শিশুকে শব্দ নিয়ে খেলতে শেখায়। একটি সাধারণ শব্দকে নতুন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করলে নতুন ছবি তৈরি হয়। এই ‘আউট অব কনটেক্সট’ চিন্তাই

সৃজনশীলতার মূল। বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা, নকশা—সব ক্ষেত্রেই এমন চিন্তার দরকার।

একজন বিজ্ঞানী যখন অদৃশ্য নীতি কল্পনা করেন, একজন প্রকৌশলী যখন নতুন নকশা ভাবেন, একজন উদ্যোক্তা যখন নতুন সেবা কল্পনা করেন—সব জায়গাতেই ভাষা, দৃশ্যকল্প ও কল্পনার ভূমিকা আছে। কবিতা ও সাহিত্য সেই কল্পনার পেশি শক্ত করে।

দুঃখের বিষয়, অনেক স্কুলে সাহিত্যকে মুখস্থ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আটকে ফেলা হয়। কবিতার আনন্দ, শব্দের সংগীত, চরিত্রের অনুভূতি, দৃশ্যকল্পের জাদু—এসব শিশুর কাছে পৌঁছায় না। ফলে সাহিত্যও পরীক্ষার আরেকটি চাপ হয়ে দাঁড়ায়।

অভিভাবকরা বাড়িতে সহজভাবে শুরু করতে পারেন। শিশুকে প্রতিদিন চার লাইন লিখতে বলুন—আজকের আকাশ, খেলায় হার, বৃষ্টির গন্ধ, মায়ের রান্না, বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া, একটি স্বপ্ন—যে কোনো বিষয়। বানান ভুল হলে আগে ভাবনাকে প্রশংসা করুন, পরে ভাষা ঠিক করুন।

কবিতা লেখা মানে সবাইকে কবি বানানো নয়। লক্ষ্য হলো ভাষার স্বাধীনতা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার সাহস এবং নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা তৈরি করা। ভবিষ্যতের যে কোনো পেশায় এগুলো অমূল্য।

অধ্যায় ২২: অটোমেশন এবং শিশুর ভবিষ্যৎ

অটোমেশন কীভাবে কাজ বদলে দেয়, তা বোঝার জন্য টেলিফোনের ইতিহাস স্মরণ করা যায়। এক সময় দূরভাষ সংযোগ দিতে মানুষের অপারেটর দরকার হত। পরে স্বয়ংক্রিয় সুইচিং এল, প্রযুক্তি কাজের ধরন বদলে দিল, এবং পুরোনো দক্ষতার চাহিদা কমে গেল। ইতিহাসে এমন পরিবর্তন বারবার ঘটেছে।

কারখানা, ব্যাংক, অফিস, পরিবহন, তথ্যপ্রযুক্তি—প্রায় সব ক্ষেত্রেই অটোমেশন মানুষের পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ কমাচ্ছে। উৎপাদন বাড়তে পারে, কিন্তু একই কাজ করার জন্য আগের মতো মানুষ লাগে না। ফলে ভবিষ্যতের চাকরিতে শুধু পরিশ্রম নয়, নতুন দক্ষতা, অভিযোজনক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা দরকার।

এতে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই; প্রস্তুত হওয়ার দরকার আছে। যে কাজ নিয়মমাফিক, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং সহজে মাপা যায়, সেটি যন্ত্র বা সফটওয়্যার করতে পারে। কিন্তু সমস্যা বোঝা, মানুষের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা, নকশা করা, নতুন ধারণা তৈরি করা, দলকে নেতৃত্ব দেওয়া, নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া—এসব মানুষের শক্তি।

শিশুদের তাই স্কুল থেকেই গণিত, যোগাযোগ, কোডিং, মৌলিক ব্যবসা-বোধ, প্রকৌশল-চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং স্বশিক্ষা শেখাতে হবে। শুধু মুখস্থ ইতিহাস বা সংজ্ঞা নয়; ইতিহাস থেকে প্যাটার্ন, বিজ্ঞান থেকে পরীক্ষা, অঙ্ক থেকে মডেল, ভাষা থেকে যুক্তি—এসব শেখানো দরকার।

ভবিষ্যতের অনেক পেশা আজও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। তাই শিশুকে একটি নির্দিষ্ট চাকরির জন্য নয়, পরিবর্তনশীল পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত করতে হবে। তার শেখার ক্ষমতা, অভিযোজন, কৌতূহল এবং সৃজনশীলতা যত শক্তিশালী হবে, প্রযুক্তির পরিবর্তন তাকে তত কম ভয় দেখাবে।

ভবিষ্যতের দক্ষতার মানচিত্র

পরীক্ষার নম্বর দরকার, কিন্তু ভবিষ্যতের জীবন টিকবে দক্ষতা, চরিত্র ও কৌতূহলের ওপর।

গণিত ও যুক্তি
সমস্যাকে মডেল করা, মাপা, বিশ্লেষণ করা।

যোগাযোগ
নিজের ভাবনা লিখে ও বলে বোঝানো।

কোডিং ও অটোমেশন
ডিজিটাল টুল দিয়ে কাজ সহজ করা।

সৃজনশীলতা
নতুন প্রশ্ন, নতুন নকশা, নতুন গল্প।

স্বশিক্ষা
নিজে শিখে নেওয়া, ভুল থেকে শেখা।

সহযোগিতা
দলগত কাজ, সহানুভূতি ও নেতৃত্ব।

অধ্যায় ২৩: আলু, পটল এবং শিক্ষার বাজার

অনেক অভিভাবক অজান্তে শিক্ষা-সম্পর্কে একটি বাজারি ধারণা পোষণ করেন: টাকা দিলেই ভালো স্কুল, ভালো কোচিং, ভালো টিউটর, আর তার ফলে ভালো ভবিষ্যৎ। কিন্তু শিক্ষা আলু-পটলের মতো কেনা যায় না। শিক্ষা শেষ পর্যন্ত শিশুর ভেতরে ঘটে—সে নিজে বুঝলে, প্রশ্ন করলে, চেষ্টা করলে, ভুল থেকে শিখলে।

শিক্ষক, স্কুল বা কোচিং সাহায্য করতে পারে। তারা দিক দেখাতে পারে, অনুপ্রেরণা দিতে পারে, ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, কাঠামো দিতে পারে। কিন্তু শেখার কাজ শিশুকেই করতে হয়। যে ছাত্র নিজে শেখার আনন্দ পায় না, তার জন্য সবচেয়ে দামি কোচিংও অল্প ফল দেবে।

ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক ছাত্র ভালো ফল করে, কিন্তু সব সাফল্যের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠানের নয়। অনেক ছাত্র নিজস্ব কৌতূহল, শৃঙ্খলা, পারিবারিক সহায়তা এবং পরিশ্রমের

কারণেও এগিয়ে যায়। আবার অতিরিক্ত কোচিং অনেক সময় সৃজনশীলতা ও স্বাধীন চিন্তাকে কমিয়ে দেয়।

শিক্ষার বাজার যখন বড় হয়, তখন বিজ্ঞাপন, ভয় দেখানো, নামী ব্র্যান্ড, সেলিব্রিটি প্রচার এবং দ্রুত সাফল্যের প্রতিশ্রুতি সামনে আসে। অভিভাবকদের তাই সতর্ক থাকতে হবে। কোনো কোর্স কেনার আগে প্রশ্ন করুন: শিশুর কৌতূহল বাড়বে কি? সে নিজে করতে শিখবে কি? ভুল থেকে শেখার সুযোগ পাবে কি? নাকি শুধু মুখস্থ করে নম্বর তোলার চাপ বাড়বে?

শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ বাজারি পণ্য বানালে দুর্বল পরিবার, উদ্বিগ্ন অভিভাবক এবং নম্বর-ভীত শিশুরা সহজেই প্রতারণার শিকার হতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শিশুর বাস্তব প্রয়োজন, সময়, বিশ্রাম, খেলাধুলা, মানসিক অবস্থা এবং শেখার আনন্দ বিবেচনা করতে হবে।

অভিভাবকের আসল দায়িত্ব টাকা খরচ করা নয়; শেখার পরিবেশ তৈরি করা। ঘরে বই থাকবে, প্রশ্নের সম্মান থাকবে, ভুলের সুযোগ থাকবে, শরীরচর্চা থাকবে, ঘুম থাকবে, কৌতূহল থাকবে। এই পরিবেশই শিশুকে এমন শিক্ষা দেয় যা কোনো বাজারে কিনে পাওয়া যায় না।

লেখক পরিচিতি

বিপ্লব পাল পেশায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তি-উদ্যোক্তা এবং বাংলা ভাষার প্রাবন্ধিক। তিনি আই.আই.টি. খড়গপুরের প্রাক্তন ছাত্র এবং দীর্ঘদিন প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ সমাজ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধর্ম, রাজনীতি এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের পরিবর্তনশীল বাস্তবতা নিয়ে। শিশুদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ দক্ষতা নিয়ে তাঁর লেখায় পরিবার, শরীরচর্চা, কৌতূহল, স্বশিক্ষা ও সৃজনশীলতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এই বইটি অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সেই ভাবনাগুলোর একটি সংগঠিত রূপ। উদ্দেশ্য হলো—শিশুকে শুধু পরীক্ষায় ভালো করানো নয়, সুস্থ, কৌতূহলী, স্বাধীন ও দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে বড় হতে সাহায্য করা।